দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১০/০৪/২০২২ (পৃঃ ৩)

শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে বাংলাদেশকে শিক্ষা নিতে হবে

ড. মো. শাহজাহান কবীর

ড. মো. শাহজাহান কবীর

শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপরাষ্ট্র। বর্তমানে চরম এক সংকটকাল অতিক্রম করছে দেশটি। চারদিকে এখন শুধু হাহাকার। জ্বালানি তেল এবং খাদ্য কেনার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সাধারণ মানুষ। সমাধান যেন হাতের নাগালের বাইরে। ৫০০ টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না এক কেজি চাল। এই চরম অবস্থায় মানুষ বিক্ষোভ এবং অবরোধ করছে। প্রতিহিংসা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। সরকারের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করছেন। প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে ও প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে ছাড়া মন্ত্রিসভার ২৬ সদস্য গত রবিবার রাতে এক বৈঠকের পর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। চলমান পরিস্থিতিতে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ ঠেকাতে দেশটিতে গত শনিবার থেকে ৩৬ ঘণ্টার কারফিউ চলছে। কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। খাদ্যে উদ্বৃত্ত একটি দেশ কেন হঠাৎ করে চরম খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত হলো এবং এর পেছনের কারণ কী!

প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে ২০১৯ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দেশে অর্গানিক কৃষি চালু করেন। সেজন্য কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। বন্ধ করা হয় সার আমদানি। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কৃষিক্ষেত্রে এবং চালের উৎপাদন ২০ শতাংশের অধিক কমে যায়। একসময় চাল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রীলঙ্কা বাধ্য হয় ৪৫০ মিলিয়ন ডলারের চাল আমদানি করতে। আমদানি সত্ত্বেও চালের দাম হু হু করে বাড়তে থাকে, সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

পাশাপাশি অর্গানিক কৃষির নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশটির চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে। চা রপ্তানি করে শ্রীলঙ্কা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেখানেও বড় ধাক্কা লাগে। কৃষকদের ক্ষতি পুষিয়ে আনার জন্য সরকার ২০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। তারপরও দেশজুড়ে খাদ্যঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করে। অর্গানিক কৃষি চালু করার আগে বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়নি। এতে দেশে উল্টো ফল হয়েছে। বিশেষ করে চাল উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামের কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার দরুন খাদ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায় এবং খাদ্য আমদানি করার জন্য আরও বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করেও সামাল দিতে শ্রীলঙ্কার সরকার ব্যর্থ হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই শোচনীয় যে, মুদ্রাস্ফীতি, উচ্চ বেকারত্ব এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অনেক শ্রীলঙ্কান, যাদের সামর্থ্য আছে, বিদেশে উন্নত জীবনের আশায় নিজ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছেন বলে রিপোর্ট হচ্ছে। যাদের দেশ ছাড়ার সামর্থ্য নেই, তারা এখন মূল পেশার বাইরে অন্যকিছু করতে বাধ্য হচ্ছেন। নয়তো মানবেতর জীবনযাপন করছেন। বিশ্ব মিডিয়ায় সেদেশের মানুষের ভয়াবহ দুর্ভোগ উঠে আসছে।

বাংলাদেশকেও শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে হবে। যেকোনো মূল্যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাল উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। চালের উৎপাদনকে সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে প্রাধান্য দিতে হবে। করোনার অভিঘাতে বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। টাকার বিনিময়েও খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ কভিড অতিমারীর ভয়াবহ পরিস্থিতি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। এই সফলতার প্রধান ও অন্যতম কারণ হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর গৃহীত যুগপৎ সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও নির্দেশনা এবং টেকসই খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার অব্যাহত সফলতা। যা দেশে-বিদেশে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ঢাকায় সম্প্রতি শেষ হওয়া ৩৬তম এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (এপিআরসি)-এ অংশ নিতে আসা এফএও-এর মহাপরিচালক চু দোয়াংয়ু কভিড অতিমারীর ভয়াবহ পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন, কভিড-১৯ মহামারী আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে আমরা যদি বিজ্ঞানচর্চায় উন্নতি না করি আমাদের ভবিষ্যৎ বিশ্ব আরও ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই রয়েছে ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধান, এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ যদি উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে চায় তাহলে হাত-মাথা (Hand-Head) দুটোকেই একসঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ করলে উন্নয়ন টেকসই হবে না। যেটি ঘটেছে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে। তাই, বিজ্ঞানভিত্তিক-উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক খাদ্য রূপান্তর ব্যবস্থায় জোর দিতে হবে।

বর্তমান সরকারের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে ধান উৎপাদনের পরিসংখ্যান বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বিগত ৫০ বছরে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চার গুণ। ২০২০-২১ সালে দেশে চালের মোট উৎপাদন ছিল ৩.৮৭ কোটি মেট্রিক টন। তথ্য মতে দেশের ১৬৯.১ মিলিয়ন মানুষের চাহিদা পূরণ করার পরেও ৩.৪৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকার কথা। যেকোনো মূল্যায়নে বাংলাদেশের এই অবস্থান প্রশংসার দাবি রাখে। কৃষির এই অভূতপূর্ব সাফল্য অনেক দেশের কাছে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। কৃষির এই উন্নয়নের ভিত্তিই হচ্ছে গবেষণায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উৎকর্ষতা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা, বিএডিসি পুনর্গঠন, উপকরণ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কৃষি খাতে সরকারি ও প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগ এবং সর্বোপরি কৃষি উন্নয়নে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণের সামগ্রিক প্রভাবে সর্বক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে 'খোরপোষের কৃষি' আজ 'বাণিজ্যিক কৃষি'তে রূপান্তরিত হয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কৃষি রূপান্তর অভাবনীয়। ১৯৭২-৭৩ সালে যেখানে দেশে চালের উৎপাদন ছিল এক কোটি টনের নিচে যা বর্তমানে ৩.৮৭ কোটি টন। যার ফলে আজ আমরা বাণিজ্যিক কৃষির কথা ভাবতে পারছি। অর্থনৈতিক গতিশীলতার জন্য কৃষি উন্নয়নের এই ধারাকে আরও বেগবান করা অপরিহার্য।

আমাদের কৃষি জমি, কৃষিতে শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কমছে অন্যদিকে বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন লক্ষণীয় তথাপি কৃষির উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১-৭২ সালে ১৪৩ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১৯৪ শতাংশ। ১৯৭১-৭২ সালে এক, দুই এবং তিন ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ৫.০৯, ২.৭৮ এবং ০.৩৮ মিলিয়ন হেক্টর। কৃষিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের সংযোজন, ফসলের সংক্ষিপ্ত সময়কাল, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা, যান্ত্রিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ পরিষেবা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং কৃষকবান্ধব নীতির কারণে এক ফসলি জমি হ্রাস পেয়ে দুই ও তিন ফসলি জমি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষিতে যোগ হয়েছে চার ফসলি জমি। বর্তমানে এক, দুই, তিন এবং চার ফসলি জমির পরিমাণ যথাক্রমে ২.২৫, ৩.৯১, ১.৭৬ এবং ০.০২ মিলিয়ন হেক্টর। একমাত্র উন্নত ফসল ধারার প্রবর্তনের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা সর্বোচ্চ বাড়ানো সম্ভব। ধানভিত্তিক ফসল ধারায় স্বল্পমেয়াদি অন্য ফসল সমন্বয় করে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে ধানের আবাদ এবং ফলনকে কোনোভাবেই সঙ্কুচিত করে নয়। তিন এবং চার ফসলি চাষের প্রবর্তনের জন্য ধানের ফলনের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে স্বল্পমেয়াদি ধানের আবাদ কাম্য হতে পারে না। আজকাল প্রায়শই স্বল্পমেয়াদি ধানের জাত উদ্ভাবন এবং কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্য ফসল শস্যক্রমে সংযোগের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ফসলের জীবনকালের সঙ্গে ফলনের একটি সরাসরি সম্পর্ক আছে। একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে ধানের ফলন কম্প্রোমাইজ করতে হবে যা কোনো ভাবেই ঠিক হবে না। যদি ধানের ফলনকে কম্প্রোমাইজ করে অধিক স্বল্পমেয়াদি জাত উদ্ভাবন এবং স্বল্পমেয়াদি জাতের আবাদ ব্যাপকভিত্তিক সম্প্রসারণ করা হয় তাহলে ধানের মোট উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে। তাছাড়া দেশীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন অজুহাত যেমন– গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি দেখিয়ে ধানের আবাদ সঙ্কুচিত করার জন্য বিভিন্ন মহল কাজ করছে। এমনকি নতুন নতুন শস্যক্রম সংযোজনের নামে ধানের আবাদকে সঙ্কুচিত করার বিষয়টি দৃশ্যমান। এ ব্যাপারে সবাইকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। বরং ধান উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, উৎপাদন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মিল রেখে ধানের আবাদ এলাকা সম্প্রসারণ– বিশেষ করে পতিত জমি চাষের আওতায় আনা, ফলন-উত্তর অপচয় হ্রাস এবং আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রাখতে হবে। ধান উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ধানভিত্তিক গবেষণা আধুনিকায়ন, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ এবং টেকসই কৃষি যান্ত্রিকীকরণে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ধান উৎপাদন অব্যাহত রাখতে নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শর্তহীন সহযোগিতা এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থা ঠিক রেখে অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীলঙ্কার সরকারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের কারণে যেখানে এত বড় বিপর্যয় সেখানে আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের আছে একজন প্রধানমন্ত্রী যার দূরদর্শী চিন্তায় কৃষিকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে এই গভীর সংকটকালে সাড়ে ২৮ হাজার কোটি টাকার উপকরণ সহায়তা দিয়ে মোট উৎপাদনকে সঠিক মাত্রায় ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা তা অনুকরণীয়। পরিশেষে বলতে চাই, বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য যখন চাল, তখন এর উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনো নেতিবাচক প্রচারণা এবং এর পেছনে কী উদ্দেশ্য ও সুদূরপ্রসারী কী কুফল বয়ে আনতে পারে তা ভেবে দেখতে হবে। নতুবা একটা সময় এসে বাংলাদেশকেও শ্রীলঙ্কার ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। মনে রাখতে হবে চাল শুধু খাদ্যশস্যই নয় বরং চালকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০৯/০৪/২০২২ (পৃঃ ১২)

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কাজ করছি

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রম হ্রাসমান প্রাকৃতিক সম্পদ (যেমন– কৃষিজমি, পানি, কৃষি শ্রমিক এবং মাটির উর্বরতা) এবং বৈশ্বিক আবহাওয়া পরিবর্তন। দেশে ধানের জমির পরিমাণ প্রতিবছর ০.৪০ শতাংশ হারে কমে যাওয়ার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিবছর হেক্টরপ্রতি ৪৪ কেজি হারে জেনেটিক গেইন বাড়ানো, কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ১ শতাংশ হারে ফলন পার্থক্য হ্রাস ও নব উদ্ভাবিত জাতগুলোর সম্প্রসারণে দীর্ঘসূত্রতা কমানো, আউশ ধান চাষের এলাকা বৃদ্ধি, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও তা সংরক্ষণ এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নদীর পানি ব্যবহারের মাধ্যমে ধান আবাদের এলাকা বৃদ্ধি করা।

সা ক্ষা ৎ কা র

ড. মো. শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

সম্প্রতি সমকালকে দেওয়া এসব কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর। তিনি বলেন, 'এক ইঞ্চি জমিও পতিত রাখা যাবে না'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা অনুযায়ী পতিত জমি আধুনিক উফশী ফসলের আওতায় এনে উন্নততর উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণ করে ২০৫০ সাল নাগাদ ৪৮ লাখ টন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

তিনি জানান, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন ও টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জাতীয় লক্ষ্য সামনে রেখে ব্রি বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বিশ্বের সর্বপ্রথম জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত ব্রি ৬২-সহ এই ধরনের ছয়টি জাত এবং পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি গুণাগুণ যেমন– প্রোটিন, আয়রন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, গাবা ও প্রো-ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ এবং লো-জিআই এবং ঔষধি গুণাগুণ সংবলিত ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ ছাড়া মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য উপাদানগুলো দেহের প্রয়োজন অনুসারে যাতে চালে সংযোজন করা যায়– এমন ধানের জাতও ব্রি উদ্ভাবন করেছে। এই নতুন ধরনের জাতগুলোর অবমুক্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ড. মো. শাহজাহান কবীরের মতে, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– প্রয়োজন মাফিক পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার শুধু উৎপাদিত হলেই হবে না, তা সাধারণ জনগণের খাবারের পাতে নিয়মিত পৌঁছাতেও হবে। গত এক দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনে বিস্তর সাফল্য অর্জন করলেও দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশের জন্য নিয়মিতভাবে পুষ্টিকর খাদ্য যেমন– মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, ফল গ্রহণ সাধ্যের অতীত রয়ে গেছে এখনও। তাদের দৈনন্দিন পুষ্টির অধিকাংশ ক্যালরি, প্রোটিন ও মিনারেল আসে ভাত থেকে। ভাত তাদের কাছে সহজলভ্য, যা তারা নিয়মিত ও যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারছেন। তাই বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভাতের মাধ্যমে আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করার লক্ষ্যে কাজ করছেন ব্রি বিজ্ঞানীরা। ছেঁটে চিকন করলে চালের পুষ্টিমান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। এটি নিরুৎসাহিত করতে ব্রি ইতোমধ্যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন বেশকিছু জাত উদ্ভাবন করেছে।

তিনি বলেন, পুষ্টিসমৃদ্ধ ও নিরাপদ ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য ব্রি বিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধুনিক বায়োফর্টিফিকেশন ও জিএম প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮-এ কৃষি উন্নয়নে ন্যানোপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ধানের উৎপাদন ও রোগবালাই দমনে ন্যানো ফার্টিলাইজার ও ন্যানো পেস্টিসাইডের প্রভাব নিয়ে ব্রিতে গবেষণা শুরু হয়েছে। আশা করা যায়, এতে দ্রুত সাফল্য অর্জিত হবে। ধানের জাত উদ্ভাবন, রোগবালাই দমন, সার ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবিধা কাজে লাগিয়ে 'উৎকৃষ্ট কৃষি' নিয়েও ব্রিতে গবেষণা চলছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্রি ইতোমধ্যে রাইস ভিশন-২০৫০ প্রণয়ন করেছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক। তিনি বলেন, বর্তমান বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা সাড়ে ২১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তাই রাইস ভিশন বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ব্রি একটি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে, উৎপাদনের গতিশীলতা অব্যাহত থাকলে চালের উৎপাদন ২০৩০ সালে ৪৬.৯, ২০৪০ সালে ৫৪.১ এবং ২০৫০ সালে ৬০.৯ মিলিয়ন টনে উন্নীত হবে। ফলে আমরা চালে ২০৩০ সালে ৪.২, ২০৪০ সালে ৫.৩ এবং ২০৫০ সালে ৬.৫ মিলিয়ন টন উদ্বৃত্ত থাকব।

THE DAILY BHORER KAGOJ
মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

তারিখঃ ০৭/০৪/২০২২ (পৃঃ ০৫)

টেকসই ধান উৎপাদনশীলতা এবং ওয়েদার-স্মার্ট প্রযুক্তি

নিয়াজ মো. ফারহাত রহমান

বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষিপ্রধান দেশ যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর ধান হচ্ছে বাংলাদেশের বৃহত্তম ফসল; বাংলাদেশের ১৬৬.৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের জন্য এটি প্রধান খাদ্য। খাদ্য নিরাপত্তা মূলত অন্যান্য ধান উৎপাদনকারী দেশের মতো বাংলাদেশেও ধান (চাল) নিরাপত্তার প্রতিফলন এবং মানুষের জীবন-জীবিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে আবাদি জমি কমছে। ক্রমবর্ধমান এই জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। ইতোমধ্যেই, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি) অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে স্থিতিশীল কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতাকে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে, আবাদি জমি হ্রাসের পাশাপাশি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে স্বল্পমেয়াদি আবহাওয়া ও দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ুর পরিবর্তন। তাই কৃষিক্ষেত্রে এই ক্রমবর্ধমান চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রভাব হ্রাস করে আবহাওয়া ও জলবায়ু স্থিতিশীল কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবং কৃষক পর্যায়ে তা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

গনজালো রিজোর (২০২২) একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেসের প্রসিডিংসে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ফলনের অগ্রগতি অর্জনে পরিবর্তিত জলবায়ু, নতুন কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি ও জিনগত প্রযুক্তি এই তিনটি বিষয়ের পৃথক পৃথক অবদানকে আলাদা করেছেন। তার প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, দশকীয় জলবায়ু প্রবণতার কারণে ফলন বৃদ্ধি হচ্ছে ৪৮ শতাংশ, কৃষিতাত্ত্বিক উন্নতির জন্য ৩৯ শতাংশ এবং মাত্র ১৩ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি হচ্ছে জিনগত উন্নতির কারণে। গবেষণার এই ফলাফলকে যদি আমরা ধান এবং আমাদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলার চেষ্টা করি তবে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর মাত্রা ও ধরন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে জিনগত উন্নতি যদি ফলনের অগ্রগতিকে মন্থর করে দেয়, তবে কৃষকদের জন্য আবহাওয়া এবং জলবায়ুর এই পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিয়ে নতুন কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও এর প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে, ওয়েদার-স্মার্ট কৃষিতাত্ত্বিক প্রযুক্তি দেশের ধান উৎপাদনে টেকসইতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) ২০১৬ সালে মানসম্মত আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং ক্রপ মডেলিং গবেষণার মাধ্যমে ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একটি সফল এবং টেকসই কৃষি আবহাওয়া ও ক্রপ মডেলিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে। এ ল্যাবরেটরিটি বহুমুখী (multi-disciplinary) গবেষকদের

একটি দল নিয়ে গঠিত হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে– বাংলাদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ু স্থিতিশীল টেকসই ধান চাষ পদ্ধতি চালু করা, যাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং ক্রপ মডেলিং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রয়োগের মাধ্যমে ধানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

বিশ্বের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কি? আমরা বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) হতে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বৃদ্ধির প্রবণতা দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। একইভাবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বৃদ্ধি দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রসারিত হচ্ছে। গড় মোট বৃষ্টিপাত দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখাচ্ছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরন ও মাত্রা স্থানিকভাবে (Spatially) পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তিত এ অবস্থায় টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষকদের আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করা প্রয়োজন।

সম্প্রতি USAID-এর সহযোগিতায় ব্রির এগ্রোমেট এবং ক্রপ মডেলিং ল্যাব কর্তৃক পরিচালিত একটি গবেষণা 'Integrated Rice Advisory System (IRAS) for Sustainable Productivity in Bangladesh'-এ আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ভিত্তিক পরামর্শ সেবা এবং কৃষকদের প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলন পার্থক্য পাওয়া গেছে। কৃষকদের প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির তুলনায় আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ভিত্তিক পরামর্শ সেবার মাধ্যমে ধান উৎপাদন করলে প্রতি হেক্টরে গড়ে প্রায় হাফ টন বেশি পাওয়া সম্ভব। উক্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ফলন পার্থক্যের কারণ হিসেবে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সার প্রয়োগের সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সময় ও পরিমাণ অনুযায়ী জমিতে সারের প্রয়োগ, বৃষ্টিপাতকে বিবেচনায় নিয়ে এবং এডব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করে জমিতে সেচ প্রদান এবং ধান গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে আবহাওয়ার তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতার সম্পর্ককে বিবেচনায় নিয়ে জমিতে আগাছানাশক, কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক প্রয়োগ। এছাড়া আবহাওয়া পূর্বাভাস-ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস হয় এবং মোট আয় বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতিতে আবহাওয়ার পূর্ভাবাসের তথ্যকে কাজে লাগিয়ে সেচের পানি, শ্রমশক্তি, জ্বালানি, সার, সেচ, আগাছানাশক, কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশকের পরিমিত ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারই উৎপাদন খরচ হ্রাসের মূল কারণ। একই সঙ্গে কৃষি উপকরণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং পরিবেশের দূষণ কমাতে সহায়ক হবে। তাছাড়া ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কম হওয়ার কারণে কৃষকদের প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির তুলনায় মোট আয়ও অনেক বেশি হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ অনুযায়ী চাষাবাদ করলে, ধানের ফলন কমপক্ষে ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় খাদ্য ঝুড়িতে ০.১৭ মিলিয়ন টন ধান যোগ করবে। যদি আবহাওয়া পূর্বাভাস-ভিত্তিক কৃষি পরামর্শ সেবা পুরো ধান উৎপাদন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য জাতীয়ভাবে এক টাকা বিনিয়োগে ৫১-৭৩ টাকা আয় হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ শতাংশ কৃষককে যদি উক্ত প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে দেশে অতিরিক্ত ০.২১ মিলিয়ন টন ধান উৎপাদন হবে।

আর এই আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ভিত্তিক পরামর্শ সেবা পদ্ধতি সফলভাবে বাস্তবায়িত হবে একটি ইনটিগ্রেটেড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, যার নাম 'ইন্টিগ্রেটেড রাইস অ্যাডভাইজরি সিস্টেম (IRAS)'। এই IRAS-এর সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর (বিএমডি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সঠিক সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করছে।

'IRAS' হচ্ছে একটি ওয়েব-বেসড ডিসিশান সাপোর্ট সিস্টেম, যার মাধ্যমে ধানের বিভিন্ন বৃদ্ধির পর্যায়ে আবহাওয়ার পূর্ভাবাসকে আমলে নিয়ে অঞ্চল-ভিত্তিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরামর্শ তৈরি ও সেবা প্রদানের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটি বহুমুখী গবেষকদের ইনপুট প্রদানের মাধ্যমে সময়মতো অবস্থান-নির্দিষ্ট ও ধানের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে রোপণ, সেচ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োগসহ ধান চাষের প্রযুক্তিগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস-ভিত্তিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বুলেটিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি করবে এবং বুলেটিনটি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রচারও করবে।

IRAS প্ল্যাটফর্মটি তৈরির ভিত্তি হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ন্যাশনাল গভর্মেন্ট পোলিসিজ, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। যেমন– বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০-এ দীর্ঘমেয়াদি পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশগত টেকসই নিশ্চিত করা এবং কার্যকরভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং শক্তিশালী, অভিযোজিত এবং সমন্বিত কৌশলের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য ডেল্টা চ্যালেঞ্জগুলোর প্রতি স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদন বাড়ায় এমন স্থিতিস্থাপক কৃষি অনুশীলনগুলো বাস্তবায়ন করা, যা বাস্তুতন্ত্র বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে জাতিসংগের টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি)-তে। এছাড়া, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, ২০২০ অনুযায়ী উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং শস্য উৎপাদন জ্ঞান ব্যবহার করে, নতুন তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি-জলবায়ু পূর্বাভাসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করে প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা উন্নত করা, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি কমাতে সহায়ক হবে। জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮-এ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মাধ্যমে কৃষকদের পরামর্শ প্রদানের জন্য সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

নিয়াজ মো. ফারহাত রহমান : ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং সমন্বয়ক; ব্রি এগ্রোমিটিওরোলোজি এন্ড ক্রপ মডেলিং ল্যাবরেটরি।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৮/০৪/২০২২ (পৃঃ ০৯)

সিংগাইরে কৃষিমন্ত্রী

‘উফশী ধানের জাত ছড়িয়ে দিতে হবে’

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

বাড়িঘর, কলকারখানা গড়ে ওঠায় কমছে কৃষিজমি। প্রতি বছর দেশে নতুন করে ২০-২৫ লাখ শিশু জন্ম নিচ্ছে। বাড়তি জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে না পারলে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। তাই বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান মাঠপর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মানিকগঞ্জের সিংগাইরে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক। এদিন তিনি সিংগাইর পৌর এলাকার কাশিমনগরে ব্রি-ধান ৮৯-৯২-এর বীজ উৎপাদন মাঠ পরিদর্শন করেন।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ছোট সময়ে দেখেছি দেশে বিঘায় তিন-পাঁচ মণ ধান উৎপাদন হতো। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল জনপ্রিয় জাত ব্রি-ধান ২৮ ও ২৯ সর্বত্র চাষ হয়। তার চেয়ে বেশি ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যার ফলন বিঘাপ্রতি ৩০-৩৩ মণ।’ তিনি বলেন, ‘সরকার সার, বীজ ও বিভিন্ন প্রণোদনা দিয়ে কৃষকদের পাশে আছে।’